Journal of Rajshahi College, **Vol. 1, Nos. 1 & 2, 2023, pp. 141-159**

বাংলার প্রত্ন-প্রযুক্তি: প্রসঙ্গ পোশাক ধৌতকরণ

মো. শাহিনুর রশীদ*

Abstract

বস্ত্র বাংলার অন্যতম প্রধান শিল্প-পণ্য। যা ইতিহাসে বহুল আলোচিত বিষয়। তবে বাংলার ইতিহাসে বস্ত্র পরিষ্কারকরণের আলোচনা স্থান পায়নি। যদিও বাংলার মানুষ বস্ত্র পরিষ্কার, শরীর ও চুলের যত্ন নিতে কী উপকরণ ব্যবহার করত, এসব উপকরণের লভ্যতা, সংগ্রহ, উৎপাদন-প্রযুক্তি, আর্থিক মূল্য, উৎপাদক ও সমাজে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ব্যবস্থার প্রভাব বিষয়ক আলোচনা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যয় বাংলা অঞ্চলেও ক্লিনিং এজেন্টের ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত ছিল এবং প্রচলিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তথ্য মতে তার প্রাচীনত্ব বাংলা অঞ্চলে সর্বাতীত একাদশ শতক পর্যন্ত প্রমাণিত হয়। জ্ঞাত তথ্যমতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এর চেয়ে প্রাচীন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে পরিষ্কারকরণ সংশ্লিষ্ট বাংলা ভাষার প্রত্ন-শব্দ বা শব্দের ব্যুৎপত্তি (etymology) চর্চার তথ্য ব্যবহার করে সাবান প্রযুক্তির ইতিহাস পুনর্গঠন করা অসম্ভব নয়। এই প্রবন্ধে সংশ্লিষ্ট বাংলা শব্দের প্রত্নতাত্ত্বিক (etymologycal) তথ্য ও তাদের সামাজিক ব্যাখ্যার সাহায্যে প্রস্তাব করা হয়েছে সাবান উৎপাদন প্রযুক্তি ও সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতির সাথে বাংলা অঞ্চলে আর্যপূর্ব অস্ট্রিক-দ্রাবিড় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

Keywords: *বাংলা, প্রত্ন-প্রযুক্তি, পোশাক, পরিষ্কার. সাবান*

ভূমিকা

বিশ্বের সর্বত্রই সমাজের গতি-প্রকৃতি ও কাঠামোর স্বরূপ অনুধাবনের জন্য প্রযুক্তির ইতিহাস-চর্চা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু বাংলার সামাজিক ইতিহাসে আলোচনার বিষয় হিসেবে প্রযুক্তির প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়নি বললেই চলে। তবে বাংলার ইতিহাস সচেতনভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বাংলার মানুষকে বা তাঁদের জীবনকে কখনই প্রযুক্তিহীন বলে প্রতীয়মান করা যায় না। যেমন, ভূমি-কর্ষণ, বীজ-সংরক্ষণ, সেচ, ধান থেকে চাউল তৈরি, তৈলবীজ থেকে তেল উৎপাদন প্রভৃতির পদ্ধতি ও প্রযুক্তির জ্ঞান না থাকলে প্রাচীনযুগ বা তার পূর্ব থেকেই বাংলার ধন উৎপাদনের প্রধান উপায় হিসেবে কৃষি-কর্ম বিবেচিত হতো না। অথচ কী উপায়ে ভূমি-কর্ষণ, বীজ-সংরক্ষণ, ধান থেকে চাউল, তৈলবীজ থেকে তেল নিষ্কাশন করা হতো– বাংলার ইতিহাস-গ্রন্থসমূহে তার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। একইভাবে বাংলার বস্ত্রের গৌরব দেশ-বিদেশের ঐতিহাসিকদের রচনায় বিশেষ গুরুত্ব পেলেও স্থানীয় মানুষ কাপড় বা

* ড. মো. শাহিনুর রশীদ, সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজ, মিরপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ, ই-মেইল: srtutul71@gmail.com

♦ **Article** received on 21 June 2023 & accepted 05 August 2023.

To cite this article: রশীদ, মো. শাহিনুর (২০২৩)। বাংলার প্রত্ন-প্রযুক্তি: প্রসঙ্গ পোশাক ধৌতকরণ। *Journal of Rajshahi College,* 1(1 & 2), 141-159.

পোশাক কী প্রক্রিয়ায় ধৌত বা পরিষ্কার করত, সে ব্যাখ্যাও করা হয়নি। এমনকি 'লোক-জ্ঞান ও প্রযুক্তি' চর্চাতেও বাংলার পোশাক ধৌতকরণ-প্রযুক্তির আলোচনা স্থান পায়নি।[১] মূলত তথ্যের সংকট এবং ইতিহাসের বিষয় নির্ধারণে রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি মনে হয় বাংলার জ্ঞান-প্রযুক্তি ইতিহাস চর্চার 'বিষয়' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে বাধা দিয়েছে। এরূপ প্রেক্ষাপটে মধ্য ও প্রাচীনযুগে বাংলা অঞ্চলে পোশাক-পরিচ্ছদ ধৌত বা পরিষ্কারের কী উপায় ছিল– সে বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস পাওয়া গেল।

ভারতীয় উপ-মহাদেশের সূত্রসমূহের মধ্যে *ঋগ্বেদ*-এ (আনু. খ্রি. পূর্ব ২৫০০-১৫০০ অব্দ) বিবিধ বস্ত্র ও উপকরণের নাম পাওয়া যায়।[২] সম্ভবত এটাই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সূত্র। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে লেখা *Periplus of the Erythrean Sea* গ্রন্থেও রোমে বাংলার রপ্তানি পণ্যসমূহের মধ্যে রেশম বস্ত্রের উল্লেখ রয়েছে।[৩] ঐতিহাসিক হেরোডোটাসও উল্লেখ করেছেন যে, ভারতে এক প্রকারের 'উল-গাছ' থেকে স্থানীয়রা ভেড়ার লোমের চেয়েও উন্নত কাপড় তৈরি করে।[৪] খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত *অর্থশাস্ত্র*-এ মগধ, পৌণ্ড্রদেশ ও সুবর্ণকুঞ্জে রেশমকীট জাত উৎকৃষ্ট বস্ত্রের খবর পাওয়া যায়।[৫] নবম শতকের আরব ভূগোলবিদ সোলায়মান রচিত *সিলসিলাত-উত-তাওয়ারিখ*-এ বাংলার সূক্ষ্ম ও মিহি সুতি বস্ত্রের উল্লেখ

---

[১] লোক-সংস্কৃতির যেসব গ্রন্থে নানান লোক-জ্ঞান ও লোক-প্রযুক্তি স্থান পেয়েছে সেরূপ কয়েকটি উদাহরণ: মুহম্মদ আবদুল জলিল, *লোকবিজ্ঞান ও লোকপ্রযুক্তি*, (রাজশাহী: মোঃ আব্দুর রহমান মুহ্‌সেনী, ২০০৪); ওয়াকিল আহমদ, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৭: লোকসংস্কৃতি*, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭) [গ্রন্থে 'লোক-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' অন্তর্ভুক্ত রয়েছে]; ওয়াকিল আহমদ, *লোকজ্ঞান ও লোকপ্রযুক্তি*, (ঢাকা: গতিধারা, ২০১০); শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য*, দ্বিতীয় খণ্ড, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮); বরুণকুমার চক্রবর্তী, *লোক প্রযুক্তি*, (কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ২০০৪); দুলাল চৌধুরী (সম্পা.), *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, (কলকাতা: আকাদেমি অব ফোকলোর, ২০০৪); বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পা.), *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*, (কলকাতা: দে বুক স্টোর, ২০১৬)।

[২] H. H. Wilson, *Rig-Veda-Sanhita*, Vol. II, (Poona: Ashtekar & Co., 1925), (II. 1. 3. 6), p. 126; H. H. Wilson, *Rig-Veda-Sanhita*, Vol. IV, (Poona: Ashtekar & Co., 1927), (VI. 1. 9. 2), p. 13; H. H. Wilson, *Rig-Veda-Sanhita*, Vol. V, (Poona: Ashtekar & Co., 1928), (IX. 6. 1. 50), p. 314; H. H. Wilson, *Rig-Veda-Sanhita*, Vol. VI, (Poona: Ashtekar & Co., 1928), (X. 2. 10.6), p. 40.

[৩] Wilfred H. Schoff (Trans.), *The Periplus of the Erythraean Sea: Travel and Trade in the Indian Ocean by a Merchant of the First Century*, (London, Bombay and Calcutta: Longmans, Green and Co., 1972), p. 256.

[৪] Herodotus, *The Histories* (Translated by George Rawlinson), (Moscow: Roman Roads Media, 2013), p. 223.

[৫] রাধাগোবিন্দ বসাক (অনু.), *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র* (কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৫), পৃ. ১১৬ ও ১১৭।

পাওয়া যায়।[৬] এছাড়া প্রত্নক্ষেত্র চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত প্রত্ন-নিদর্শনসমূহে (খ্রি.পূর্ব ১ - খ্রি. ১ অব্দ)[৭], বাংলায় প্রাপ্ত মৌর্য, শুঙ্গ, কুশান, গুপ্ত, পাল যুগের টেরাকোটায়[৮], সপ্তম শতকের চৈনিক বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী ইৎসিঙ-এর বর্ণনায়[৯] এবং বাংলা সাহিত্যে[১০] সমকালীন সাধারণ ও রাজকীয় পোশাক-পরিচ্ছদের চমৎকার চিত্র ফুটে উঠেছে।[১১] তাই এসব পোশাক পরিষ্কার করার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয় অস্বীকার করা যায় না। সাধারণভাবে এ প্রশ্ন করা যেতে পারে এসব পোশাক (সাধারণ ও রাজকীয়) পরিষ্কারকরণে পানির ব্যবহার হতো কি না? হলেও সে পানিতে কাপড় থেকে ময়লা পৃথক করার জন্য কোন দ্রব্য মিশ্রণ করা হতো কি না? এসব প্রশ্ন উত্থাপন বা তার উত্তর জানার চেষ্টা করা নিশ্চয় অপ্রাসঙ্গিক নয়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো বিষয়টি ইতিহাসের আলোচ্য বিষয় কি-না? বাংলার মানুষ কাপড় পরিষ্কার করত কি না এবং তার উত্তর হাঁ অথবা না– শুধু এ টুকু জানার জন্য এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি।

---

[৬] Eusebius Renaudot (Trans.), *Ancient Accounts of India and China by Two Mohammedan Travellers, Who Went to Those Parts in the 9th Century*, (London: Sam. Harding, 1733), p. 17.

[৭] Enamul Haque, *Chandraketugarh: A Treasure-house of Bengal Terracottas*, (Dhaka: ICSB, 2001).

[৮] Saifuddin Chowdhury, *Early Terracotta Figurines of Bangladesh*, (Dhaka: Bangla Academy, 2000).

[৯] I-Tsing, *A Record of the Buddhist Religion as Practised in India and the Malay Archipelago (A.D. 671-695)* (Trans. by J. Takakusu), **(**Oxford: Clarendon Press, 1896), Chapter X.

[১০] স্বদেশরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, 'প্রাচীন বাঙলা কাব্যে বস্ত্র-শিল্প', *বঙ্গশ্রী*, চৈত্র ১৩৪৬ (১ম খণ্ড ৩য় সংখ্যা), পৃ. ৩৬৯-৩৭৭।

[১১] বাংলাদেশে পোশাকের ইতিহাসও স্বল্প আলোচিত বিষয়। অথচ ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্ট ইনস্টিটিউটে 'পোশাকের ইতিহাস' অধ্যয়ন সূচিত হয়। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে *Textile History* নামে জার্নাল প্রকাশিত হয়ে আসছে। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় The Association of Dress Historians. এই প্রতিষ্ঠান ২০১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতিবছর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনও করে আসছে (https://dresshistorians.org)। বাংলা ও ভারতীয় পোশাকের আলোচনার জন্য দেখুন: গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, 'প্রাচীন শিল্প-পরিচয়', *সাহিত্য*, বর্ষ ২৪, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩২০), পৃ. ৬-১২ এবং বর্ষ ২৪, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১৩২০), পৃ. ১৩২-১৩৯; মলয় রায়, *বাঙালির বেশবাস: বিবর্তনের রূপরেখা*, (কলকাতা: মনফকিরা, ২০২০), প্রথম প্রকাশ ২০১৩; লাবিবা আলী, 'মুসলিম আত্মপরিচয় (১৩০০-১৬০০ সা. অব্দ)', আবদুল মমিন চৌধুরী (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস: সুলতানি ও মোগল যুগ (আনু. ১২০০-১৮০০ সা. অব্দ), দ্বিতীয় খণ্ড*, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০২০), পৃ. ৪৭-৫৬; সুমিত দাস, *ভারত থেকে ম্যাঞ্চেস্টার: প্রথম বিশ্বায়িত পণ্য- সুতিবস্ত্র*, (কলকাতা: পিপলস্ বুক সোসাইটি, ২০২০); সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, 'পোশাক, অলংকরণ ও প্রসাধনী', সুফি মোস্তফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃ. ২৩৪-২৬৫; Charles Fabri, *A History of Indian Dress*, (Calcutta: Orient Longmans, 1960).

একটি সমাজ কতটা উন্নত, প্রযুক্তি ব্যবহারে কতটা অভ্যস্ত, ব্যবহৃত প্রযুক্তি কিভাবে তাঁদের জীবন ও সমাজকে প্রভাবিত করেছে ইত্যাদি প্রশ্ন নিশ্চয় সমকালীন সমাজের কাঠামো ও সামাজিক স্তরবিন্যাস জানতে সাহায্য করে। তাই সামাজিক ইতিহাস চর্চায় সামাজিক প্রযুক্তির আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।[১২]

বর্তমানে 'মধ্যযুগীয় রীতি', 'প্রাচীন পদ্ধতি', 'সনাতন প্রথা' প্রভৃতি নেতিবাচক প্রত্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর কারণ কি? সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। তবে বাংলার মানুষ সত্যই মূর্খ, গেঁয়ো, প্রযুক্তিহীন জীবন-যাপন করত কিনা– সেটা বাংলা সনাতন প্রযুক্তি'র অধ্যয়ন ব্যতীত জানা সম্ভব নয়। তাই আমাদের পূর্বসূরীরা কতটা 'জ্ঞানহীন' ছিলেন তা জানার জন্যও প্রযুক্তির চর্চা আবশ্যক।

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অধ্যয়নে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ইতিহাস পাঠক্রমে স্থান পায়নি। সেখানে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সর্বশেষ তত্ত্ব ও ব্যবহারিক বিষয়ই মাত্র চর্চার বিষয়- যা স্বাভাবিকই বটে। কিন্তু 'সর্বশেষ তত্ত্ব' হঠাৎ আবির্ভূত হয় না, তার একটি অতীত থাকে; বরং সে তত্ত্ব অতীত অনেক জ্ঞান-চর্চার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বা পরবর্তী ধাপ মাত্র। তাই বলা যায়, বর্তমান বিজ্ঞান-প্রযুক্তির চর্চা অনেকটা মূলহীন বৃক্ষ। টেকসই জ্ঞান-চর্চার উদ্দেশ্য শুধু বর্তমানের সমাধান নয়; বরং অতীত ঐতিহ্য অনাগতদের জন্য সুরক্ষিত রাখার প্রচেষ্টা। এ জন্য অবশ্যই প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের অতীত স্তরের উপযোগিতার সাথে পরিচয় থাকা; প্রয়োজনীয় জ্ঞানের সেই অতীত স্তরের দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল কতটা টেকসই তা জানা। কার্যত এর পরই অতীতের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং অধিক উপযোগী ও টেকসই করা সম্ভব, নতুবা নয়। "কেননা ইতিহাস এমন একটি 'ডিসিপ্লিন' বা বিষয়, যা মানুষের সামাজিক সত্তা, সমাজের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক করে দেয়। .... অতীত বিষয়ে আমাদের জ্ঞানই কিন্তু বর্তমান বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে দেয়। সুতরাং অতীত বলতে কী বুঝছি, কী জানছি, সেটা আমাদের স্থির করতে হবে খুব সতর্কভাবে।"[১৩] অতএব, মধ্য ও প্রাচীনযুগে বা তারও পূর্বে বাংলা অঞ্চলে পোশাক-পরিচ্ছদ ধৌত বা পরিষ্কারে ব্যবহৃত জ্ঞান-প্রযুক্তির ইতিহাস অন্বেষণ মোটেও অযৌক্তিক নয়।

প্রেক্ষাপট

বাংলাসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কারকরণে নানাবিধ পদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহার করে থাকে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সংশ্লিষ্ট এসব পণ্যের মধ্যে

---

[১২] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন: ইরফান হবিব, 'ইতিহাস-গবেষণায় প্রযুক্তি-চর্চার গুরুত্ব', ইরফান হবিব (সম্পা.), *মধ্যকালীন ভারত: প্রথম খণ্ড*, (কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০০৭), পৃ. ১৪-৩৮।

[১৩] রোমিলা থাপর [থাপার], 'ক্রমাগত স্মরণ করাতে হবে', *দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা* (সাক্ষাৎকারভিত্তিক উপ-সম্পাদকীয়), ১৫ আগস্ট ২০২১ খ্রি., কলকাতা, পৃ. ৪।

সাবান[১৪] নিঃসন্দেহে অন্যতম প্রাচীন। জ্ঞাত তথ্য মতে সাবান ব্যবহারের প্রথম দৃষ্টান্ত প্রমাণিত হয়েছে ব্যবিলন সভ্যতায়। সেখানে খ্রিস্টপূর্ব ২৮০০ অব্দের চর্বি ও ছাই মিশ্রিত সাবানের নমুনা পাওয়া গেছে।[১৫] ১৯৫৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার টেম্পল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর মার্টিন লেভি সুমেরিয়ান একটি মৃৎ-ফলক (clay tablet) আবিষ্কার করেন। এই ফলকে উৎকীর্ণ লিপিসূত্রে জানা যায়, সুমেরীয়রা ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সাবান তৈরি এবং পশমি-পোশাক ধোয়ার জন্য সেই সাবান ব্যবহার করেছিল।[১৬] খ্রিস্টপূর্ব ২২০০ অব্দের অপর একটি মৃৎ-ফলকে বলা হয়েছে সাবান তৈরির প্রধান উপকরণ হলো ক্ষার ও তেল।[১৭] খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দের নথিসূত্রে জানা যায়, মিশরীয়গণ পশুর চর্বি বা উদ্ভিজ্জ তেল ও নীল উপত্যকার প্রকৃতি থেকে সংগ্রহকৃত সোডা জাতীয় উপাদান (ট্রোনা) দিয়ে সাবান

---

[১৪] বিজ্ঞানের ভাষায় বস্ত্র থেকে ময়লা পৃথক করতে পানি উত্তম মাধ্যম। আর সে পানিতে বিশেষ ও নির্দিষ্ট উপাদান (দ্রব্য) মিশ্রণ করলে সহজেই বস্ত্র থেকে ময়লাকে পৃথক করা যায়। এ বিশেষ উপাদানকে বলা হয় ডিটারজেন্ট (cleaning agent)। ক্ষার (alkali) অন্যতম কার্যকর ডিটারজেন্ট, যা পানিতে দ্রবণীয়। বর্তমানে ডিটারজেন্ট কেক, গুড়া ও তরল আকারে বাজারে প্রচলিত। এদের মধ্যে কেক-ডিটারজেন্টই মূলত সাবান নামে পরিচিত, যা মূলত ক্ষার ও তেল বা চর্বির যৌগ। বিজ্ঞানের পরিভাষায় সাবান হলো উচ্চতর ফ্যাটি এসিডের সোডিয়াম বা পটাশিয়াম লবণ। [D. H. Everett, *Manual of Symbols and Terminology Für Physicochemical Quantities and Units* (Appendix II: Definitions, Terminology and Symbols in Colloid and Surface Chemistry, Part I), (London: Butterworths, 1972), p. 612.] বিশ্বে নানান ধরনের ক্ষার রয়েছে। যেমন, কস্টিক সোডা {সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH)}, ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ($CaOH_2$), এ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NH_4OH,) প্রভৃতি। এদের মধ্যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড পাওয়া যায় সোডিয়াম কার্বনেট (Na2CO3) নামক একটি রাসায়নিক যৌগ থেকে, যা ওয়াশিং সোডা, সোডা অ্যাশ নামেও পরিচিত। সাবানের আকৃতি, ধরন ও উপযোগিতা নির্ধারণের জন্য কস্টিক সোডার সাথে বিবিধ উপকরণ ও প্রয়োজনে তেল-চর্বি ব্যবহৃত হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় সাবানের দুটি অংশ- একটি পোলার (polar) অন্যটি অপোলার (non-polar)। কাপড়ের ময়লা গ্রীজ জাতীয় পদার্থ, যা অপোলার। ময়লা কাপড়কে পানি ও সাবানের সাথে সংস্পর্শিত করলে সাবানের অপোলার অংশ অপোলার ময়লার সাথে এবং পানি যেহেতু পোলার সেহেতু সাবানের পোলার অংশ পানিতে দ্রবীভূত হয়। দুই পোলার অংশ মিলিত হয়ে ফোম বা ফেনা তৈরি করে। এই প্রক্রিয়ায় কাপড় থেকে ময়লা বিচ্যুত হয়।

[১৫] Michael Willcox, 'Soap', Hilda Butler (ed.), *Poucher's Perfumes, Cosmetics and Soaps*, (Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 2000), 10th ed., first pub., 1923, p. 453.

[১৬] H. Verbeek, 'Historical Review', J. Falbe (ed.), *Surfactants in Consumer Products: Theory, Technology and Application*, (Berlin: Springer-Verlag, 1987), p. 1.

[১৭] Luis Spitz, 'The History of Soaps and Detergents', Luis Spitz (ed.), *SODEOPEC: Soaps, Detergents, Oleochemicals, and Personal Care Products*, (Champaign: AOCS Press, 2004), p. 1

তৈরি করত।[১৮] প্রাচীন চিনেও ভেষজ সাবান তৈরি হতো।[১৯] ৮০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইউরোপে সাবান সাধারণ পণ্যে পরিণত হয়। বারো শতকে সাবানের উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি পায় এবং সমগ্র ইউরোপে ব্যবহৃত হতে থাকে। এই সাবান তৈরি হতো পশুর চর্বি থেকে। অবশ্য এর গন্ধ ছিল খুবই খারাপ। এসময়ে ভূ-মধ্য সাগরীয় অঞ্চলে আরবরা সোডা-ভস্ম ও জলপাই তেল দিয়ে অপেক্ষাকৃত নরম ও সুগন্ধি কেক-সাবান তৈরি করতে সক্ষম হয়। এর মধ্য দিয়ে সাবানের বাণিজ্যও স্পেন ও মেডিটেরিয়ান অঞ্চলে কেন্দ্রভূত হয়ে পড়ে।[২০] সাবানের এই উন্নতি সাধনে আল রাজীর ভূমিকা অনন্য। তিনি অলিভ তেল থেকে গ্লিসারিন উৎপাদন প্রণালিও আবিষ্কার করেন। ফলে এই সময় ক্ষারের সাথে জলপাই তেল, গ্লিসারিন, লেবুসহযোগে উন্নত সাবান তৈরি হতে থাকে। তখন নাবলুস, দামেস্ক, আলপ্পো প্রভৃতি শহরে সাবান তৈরির কারখানা গড়ে উঠে। এসব কারখানায় উৎপাদিত সাবান অন্যত্র রপ্তানি করা হতো।[২১]

ভারতে শরীর ও কাপড় পরিষ্কারের প্রত্ন-তথ্য[২২] পাওয়া গেলেও কেক-সাবানের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। সম্ভবত বারো শতকের পরে তা ভারতে প্রসার লাভ করে। *সিরাৎ-ই-ফিরোজশাহি* সূত্রেও জানা যায় ১৩৭২ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে সাবান উৎপাদন হতো।[২৩] দিল্লি

---

[১৮] H. Verbeek, *op.cit.*, p. 1.

[১৯] Geoffrey Jones, *Beauty Imagined: A History of the Global Beauty Industry*, (Oxford: Oxford University Press, 2010), 71; বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Edward H. S Cxafer, 'The Development of Bathing Customs in Ancient and Medieval China and the History of the Floriate Clear Palace', *Journal of the American Oriental Society*, Vol. 76, No. 2 (Apr. - Jun., 1956), pp. 57-82.

[২০] Charles Singer, E. J. Holmyard, A. R. Hall and Trevor I. Williams (Ed.), *A History of Technology, Vol. II (The Mediterranean Civilizations and The Middle Ages, C 700 BC to 1500 AD)*, (New York and London: Oxford University Press,1956), pp. 355-356.

[২১] Ahmad Y. Al-Hassan, 'Alchemy, Chemistry and Chemical Technology', In A. Y. Al-Hassan (ed.), *The Different Aspects of Islamic Culture Vol. 4 (Science and Technology in Islam), Part 2 (Technology and Applied Sciences)*, (Paris: UNESCO, 2001), p. 74.

[২২] ভারতে অনেক ধরনের সাবান-ফলের বৃক্ষ ছিল। এদের মূল ও ফল পরিষ্কার কাজে ব্যবহৃত হতো। সেসব বৃক্ষের মধ্যে অন্যতম হলো- *Sapindus Emargmata, Maduriensis, Saponarius, Senegalensis.* (সূত্র: Albert Neuburger, *The Technical Arts and Sciences of the Ancients* (Tran. Henry L. Brose), (London: Methuen & Go. Ltd., 1930), p. 175. কামসূত্রেও বলা হয়েছে যে, একজন বিত্তবান প্রতিদিন তেল মেখে গোসল করেন এবং প্রতি তৃতীয় দিনে শরীরে সাবান জাতীয় পরিষ্কারকারক ব্যবহার করেন। *The Kama Sutra of Vatsyayana*, Benares, 1883-1925, p. 18; Haran Chandra Chakladar, *Social Life in Ancient India: Studies In Vatsyayana's Kamasutra*, Calcutta: Greater India Society, 1929, p. 158. বৃহৎসংহিতা সূত্রেও স্নান, কেশ পরিষ্কার, সুগন্ধি প্রভৃতির তথ্য পাওয়া যায়। Varaha Mihira, *Brhat Samhita* (trans. and notes V. Subrahmanya Sastri and M. Ramakrishna Bhat), (Bangalore: V.B. Soobbiah & Son, 1946), Ch. LXXVII.

[২৩] Irfan Habib, *Technology in Medieval India, c. 650-1750*, (New Delhi: Tulika Books, 2009), p. 76.

সালতানাতে সাবান খুবই গুরুত্বপূর্ণ পণ্য ছিল। এর উৎপাদন ও ব্যবহার ব্যাপক ছিল– এই অনুসিদ্ধান্ত অমূলক নয়। কারণ সেই সময় সাবান উৎপাদকদের (সাবুন-গরী) কর দিতে হতো। উৎপাদন ও বিপণন সুবিস্তৃত না হলে তাতে প্রশাসন করারোপ করত না। যদিও সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রি.) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সাবুন-গরীদের উপর থেকে কর প্রত্যাহার করে নেন।[২৪] নিশ্চয় এর ফলে সাবানের বিক্রয় মূল্য হ্রাস পেয়েছিল। তবে *আইন-ই-আকবরি* সূত্রে জানা যায় তৎকালে বেরার প্রদেশে সাবান প্রস্তুত করা হতো এবং সেটা থেকে প্রচুর রাজস্ব পাওয়া যেত।[২৫] ঔপনিবেশিক আমলের দলিলপত্রেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত বোম্বে, পাঞ্জাব, বাংলা, সিন্ধু প্রভৃতি প্রদেশে সাবান উৎপাদনের তথ্য পাওয়া যায়।[২৬]

---

[২৪] *Futuhat-i-Firuz Shahi* (edited with introduction, translation & notes Azra Alvi), (Delhi: Idara-i-Adabiyat-i-Delhi, 1996), p. 22.

[২৫] Abul Fazl-i-'Allami, *'Ain-I-Akbari*, Vol. II, (Tran. H.S. Jarrett), (Calcutta: Royal Asiatic Society of Bengal, 1949), p. 239.

[২৬] বোম্বে প্রেসিডেন্সির কায়রা (Kaira) জেলায় সাবান উৎপাদন করত মুসলমানরা। সাবান তৈরি করতে তাঁরা ক্ষার, সোডা, লেবু (চুন?) ও মহুয়া তেল ব্যবহার করত। মহুয়া তেলের পরিমাণের ভিত্তিতে এই সাবানের দাম কম বেশি হতো। সেখান থেকে সাবান আহমেদাবাদ, সুরাট, ব্রোচ, কাঠিয়াওয়ার ও বোম্বে শহরে পাঠানো হতো। সাবানের এই ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে দাউদি বোহোরা সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এছাড়া পাঁচ মহলেও সাবান তৈরি হতো। [দেখুন, *Gazetteer of the Bombay Presidency, Vol. III (Kaira and Panch Mahals)*, (Bombay: Government Central Press, 1879), pp. 76 & 250.] কাপদভঞ্জের মতো লুনাভাদা ও বালাসিনোরেও সাবান উৎপাদন হতো। সেখানে সাবান তৈরিতে লোনা মাটি ব্যবহৃত হতো। তার সহ-উপকরণ ছিল পানি, চুন (লেবু) সোডা ও তেল। সবান তৈরির পর সেগুলোতে সিল দিয়ে চিহ্নিত করা হতো। এসব সাবান কাপড় কাচার জন্য অধিক ব্যবহৃত হতো। সবান রপ্তানি করে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে লনাভাদা ও বালাসিনোর ৫০,০০০ রুপি আয় করে। [দেখুন, *Gazetteer of the Bombay Presidency, Vol. VI (Rewa Kanta, Narukot, Cambay and Surat)*, (Bombay: Government Central Press. 1880), pp. 57 & 58.] গত পঞ্চাশ বছরে প্রান্তিজে একটি বড় সাবান তৈরির শিল্প গড়ে উঠে। কাঁচামালও হাতের নাগালে এবং সস্তা। জ্বালানি ও মহুয়া, *বাসিয়া লাতিফোলিয়া*, *বেরি* উত্তরের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে আনা হয়; সোডা আসে পাশের গ্রাম বাঘপুর থেকে এবং মোডাসার কাছে থেকে আসে চুন। অনুমান করা হয় যে বছরে ২১৪ টন (১২,০০০ মণ) সাবানের জন্য ৭৪ টন (৪০০০ মণ) তেল ব্যবহৃত হয়। বেশিরভাগ সাবান যায় আহমেদাবাদে এবং সেখান থেকে কিছু পাঠানো হয় বোম্বেতে। এই শিল্প প্রধানত সুন্নি বোহোরাদের নিয়ন্ত্রণে। [দেখুন, *Gazetteer of the Bombay Presidency, Vol. IV (Ahmedabad)*, Bombay: Government Central Press. 1879, pp. 134 & 135.] ওয়াধওয়ান ছিল দেশীয় সাবান তৈরির কেন্দ্র। সেখানে সাবান তৈরি করতে ভেরেন্ডার তেল (ক্যাস্টর অয়েল), মহুয়ার তেল, সোডা এবং চুন মেশানো হতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাবানের সঙ্গে সুগন্ধী বা রং মেশানো হতো। নির্মাতারা প্রধানত বোহোরা সম্প্রদায়ের মানুষ। [দেখুন, *Gazetteer of the Bombay Presidency, Vol. VIII (Kathiawar)*, (Bombay: Government Central Press. 1884, pp. 161 & 162] কানারাতে প্রচুর সোপ-নাট বৃক্ষ জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা হতো। [দেখুন, *Gazetteer of the Bombay Presidency, Vol. XV (part I: Kanara)*, (Bombay: Government Central Press. 1883), pp. 30 & 35.] একইভাবে *The Imperial Gazetteer of India*-এর অন্যান্য অনেক খণ্ডেও ভারতের নানান স্থানে যে সাবান উৎপান হতো তার খবর এবং সাবান উৎপাদন প্রক্রিয়া, উপকরণ, দাম, উৎপাদক ও বাণিজ্যের তথ্য পাওয়া যায়।

বাংলা অঞ্চলে বস্ত্র পরিষ্কার সংস্কৃতি

জ্ঞাত তথ্য মতে বাংলা অঞ্চলের কোন প্রত্ন-ক্ষেত্র থেকে সাবান বা তৎ-সংশ্লিষ্ট কোন নিদর্শন বা অন্য কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। তবে ঔপনিবেশিক রচনায় সাবান উৎপাদন, উৎপাদক ও উপকরণ প্রভৃতির তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া নিকট অতীতের বাংলা সাহিত্যে, মধ্যযুগের সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে বস্ত্র পরিষ্কারের উপকরণ সাবান, ক্ষার, সাজিমাটি, পেশাজীবী হিসেবে রজক বা ধোপার উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীনযুগের একটি তাম্রলিপিতেও ধোপার উল্লেখ পাওয়া গেছে।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে ঢাকাতে গড়ে ওঠা শিল্পসমূহের মধ্যে সাবান অন্যতম। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ৩০,০০০ রুপির মূলধন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বুলবুল সাবান ফ্যাক্টরি। জাপান থেকে প্রশিক্ষিত সরোজেন্দ্র গুহ এই কারখানার প্রকৌশলী ছিলেন। ১৯০৬-০৭ বর্ষের Indian Industrial Exhibition-এ বুলবুল সাবান ফ্যাক্টরি প্রথম পুরস্কার পায়।[২৭]

উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশকের ঢাকার সিভিল সার্জন জেমস ওয়াইজের মতে, হিন্দুদের কাছে সাবান ছিল এক অচেনা অজানা বস্তু। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য তারা ব্যবহার করতেন সাজিমাটি ও বেশম। ঢাকার রফতানি দ্রব্যের মধ্যে সাবান অন্যতম। বাংলার সর্বত্র এর কদর আছে। এমনকি বার্মার পেনাং ও মালয়ে এ সাবান পরিচিত। তিনি সাবান প্রস্তুত-প্রণালি উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, আশি পাউন্ড পাত্তা ও চল্লিশ পাউন্ড সাজিমাটির সঙ্গে পানি মিশিয়ে জাল দেয়া হতো যতক্ষণ পর্যন্ত না সব লবণ গলে যায়। এর পর এগুলো মটকায় ঢেলে তাতে মেশানো হয় পশুর চর্বি ও তিলের তেল। আবার জাল দেয়া হয়। কয়েক দিন রেখে দিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়। সাবান এবারে বাজারের জন্যে প্রস্তুত। তবে উৎকৃষ্ট মানের সাবান পেতে হলে জাল দিতে হয় তিন চার বার। ভাল সাবান প্রস্তুত করতে সময় লাগে দুই সপ্তাহ।[২৮] ফ্রান্সিস বুকানন বিহারের সাবান উৎপাদন, শ্রমিক, উপকরণ, দাম প্রভৃতির বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন।[২৯]

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ঢাকা ফ্যাক্টরির কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন–বাংলায় উৎপাদিত সাবানের মধ্যে ঢাকার সাবান সর্বাপেক্ষা উন্নত, যা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এবং বসরা, জেদ্দা প্রভৃতি শহরে রপ্তানি করা হতো। এই সাবানের উৎপাদন

---

[২৭] Sirajul Islam, 'Business History of Dhaka upto 1947', Delwar Hassan (ed.), *Commercial History of Dhaka*, (Dhaka: Dhaka Chamber of Commerce and Industry, 2008), pp. 39-41; Selim Raihan & Abu Eusuf, 'Growth of Private Business Houses in Dhaka after 1971', Delwar Hassan (ed.), *op.cit.*, pp. 164 & 165.

[২৮] James Wise, *Notes on The Races, Castes, and Trades of Eastern Bengal* (London: Harrison and Sons, 1883), p. 105.

[২৯] Francis Buchanan, *An Account of the District of Bihar and Patna in 1811-1812: Vol. II*, (Patna: The Bihar and Orissa Research Society, 1939), p. 616ff.

উপকরণের অনুপাত ছিল: ঝিনুক-চুন ১০ মণ, সাজিমাটি ১৬ মণ, লবণ ১৫ মণ, তিলের তেল ১২ মণ এবং ছাগলের চর্বি ১৫ সের।[৩০]

সাহিত্যেও সাবান প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। যেমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-৪১) *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে নিখিলেশ মেজরানীর জন্য বাক্স বাক্স দেশী সাবান কিনলে বিমলা দেশী সাবানকে অবজ্ঞাসুরে বলে 'সে কি সাবান, না সাজিমাটির ড্যালা!'[৩১] এই সূত্রে জানা যায়, তখন বাংলায় দেশীয় সাবান উৎপাদন শুরু হয়েছে। কিন্তু তা ততো উন্নত নয় শক্ত, বরং সাজিমাটির খণ্ডের ন্যায়।

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে 'চাষার দুক্ষ' প্রবন্ধে লিখেছেন– "পূর্ব্বে পল্লীবাসিনীগণ ক্ষার প্রস্তুত করিয়া কাপড় কাচিত; এখন তাহাদের কাপড় ধুইবার জন্য হয় ধোপার প্রয়োজন, নয় সোডা। চারি পয়সার সোডায় যে কার্য্য সিদ্ধ হয়, তাহার জন্য আর কষ্ট করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে কেন?'[৩২] বিভূতিভূষণের (১৮৯৪-১৯৫০) রচনাতেও এই ক্ষারের প্রসঙ্গ এসেছে। দুর্গা অপুকে তেল ও নুন আনতে বলে যেহেতু "মা-র আসতে ঢের দেরী– ক্ষার কাচতে গিয়েচে।"[৩৩] শুধু সাধারণ মানুষই না, রাজা রানিরাও পরিষ্কারকরণে ক্ষার ব্যবহার করতেন। তাইত দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭)-এর সাহিত্যে রাজকীয় ব্যক্তিবর্গের পোশাক ও শরীর পরিষ্কারকরণে ক্ষার ও খৈল ব্যবহারের একাধিক উল্লেখ রয়েছে। 'পাতাল-কন্যা মণিমালা' গল্পে মণিমালাকে ক্ষার ও খৈল দিয়ে শরীর পরিষ্কার করাতে দেখা যায়; 'কাঁকনমালা, কাঞ্চনমালা' গল্পে দাসী রানিকে বলছে, "রাণী মা, তুমি বড় কাহিল হইয়াছ; কতদিন না-জানি ভাল করিয়া খাও না, নাও না। গায়ের গহনা ঢিলা হইয়াছে, মাথার চুল জটা দিয়াছে। তুমি গহনা খুলিয়া রাখ, বেশ করিয়া ক্ষার-খৈল দিয়া স্নান করাইয়া দেই।" অপর একটি গল্প 'শীত বসন্ত'-এ সুয়োরানি দুয়োরানিকে ডেকে বলছেন– "আয় তো, তোর মাথায় ক্ষার খৈল দিয়ে দি।" আবার 'সুখু আর দুখু' গল্পেও দুখুকে একটু তেল মাথায় ছুঁয়ে এক চিমটি ক্ষার খৈল নিয়ে জলে নেমে ডুব দিতে দেখা যায়।

কার্যত যাঁরা জীবিকার জন্য কাপড় ধোয় তাঁরা ধোপানী, ধোপা, ধোবা, রজক প্রভৃতি নামে পরিচিত। মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রায়ই তাঁরা উল্লিখিত হয়েছেন। আঠারো শতকে মানিকরাম গাঙ্গুলী লিখেছেন, 'কুমার কামার সাজে কলু মালী ধবা।/ ভারি তেলি বাগুনি বেপারিজীবী যেবা॥'[৩৪] আরো পূর্বে আঠারো শতকের প্রথম দশকের পূর্বে কেতকা দাস তাঁর *মনসামঙ্গল*

---

[৩০] *A Descriptive and Historical Account of the Cotton Manufacture of Dacca, in Bengal*, (London: John Mortimer, 1851), p. 93.

[৩১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ঘরে-বাইরে*, (কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯২৬), চতুর্থ সং. ১ম প্রকাশ ১৯১৫, পৃ. ১৬৪।

[৩২] আবদুল কাদির (সম্পা.), *রোকেয়া-রচনাবলী*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৫), পৃ. ২১৬।

[৩৩] বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পথের পাঁচালী*, (ঢাকা: চৌধুরী এণ্ড সন্স, ২০০৬), পৃ. ৫১।

[৩৪] মানিকরাম গাঙ্গুলী, *ধর্মমঙ্গল* (বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পা.), (কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০), পৃ. ৩৭৭।

কাব্যের 'বেহুলার দেব-বস্ত্র ধৌতকরণ' অধ্যায়ে লিখছেন আরো বিস্তারিত– বেহুলা দেব-বস্ত্র নিজ হাতে কাচার জন্য ধোপানীর নিকট মিনতি করে এবং পায়ে পড়ে। শেষে ধোপানী রাজি হয়। দেখা যাচ্ছে ধোপানী কাপড় কাচে 'ক্ষার আর জলে' অপর দিকে বেহুলা শুধু 'গঙ্গাজলে' তবু ধোপার কাপড় কাঁচড়ার ফুলের ন্যায় অপর দিকে বেহুলার কাপড় যেন 'সূর্য্যসমতুল'।[৩৫] ভারতচন্দ্রের (১৭১২-১৭৬০) রচনাতেও ধোপার প্রসঙ্গ এসেছে (ধোপা বধি বস্ত্র পরি কুজারে সুন্দরী করি/ সুশোভিত মালির মালায়॥)।[৩৬] সমসাময়িক পর্তুগিজ ধর্মপ্রচারক মানুয়েল দা আসসুম্পসাঁও তাঁর অভিধানে সাবান শব্দ উল্লেখ করেছেন।[৩৭] বেহুলা-লক্ষীন্দরের বিয়ের আয়োজনে নানান শ্রেণি-পেশার মানুষের ব্যস্ততার মধ্যেও ধোপার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সতেরো শতকের কবি আবদুল হাকিম রচিত *লালমোতি সয়ফুল মুলক* গ্রন্থে ধোপা অর্থে রজক উল্লিখিত হয়েছে 'রজকের হস্তে আন অতি দিব্য বাস' হিসেবে।[৩৮]

একইভাবে ষোল শতকের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর (আনু. ১৫৪০-১৬০০) *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে উল্লিখিত হয়েছে, "নগরে করিআ শোভা নিবসে অনেক ধোবা/ দড়ায় শুখায় নানা বাসে/ দরজি কাপড় শিঞে [সেলাই করে] বেতন করিআ জিঞে/ গুজরাটে বৈসে এক পাশে।"[৩৯] এই কাব্যে আরো উল্লিখিত হয়েছে– "নিশা মধ্যে আনিহ দেউলের পাটিকাল/ পুজিবে ধোবার পাটে জালি দিব জ্বাল।"[৪০] এসময়ে বাংলায় নতুন কাপড় শুভ্রকরণের উত্তম ব্যবস্থা ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সম্রাট আকবরের সভাসদ আবুল ফজলের (১৫৫১-১৬০২) রচনায়। তিনি উল্লেখ করেছেন সরকার সোনারগাঁও-এর এগারসিন্ধুতে এমন এক জলাশয় আছে যাতে কাপড় অপূর্ব শুভ্র রূপ ধারণ করত।[৪১] পনেরো শতকের কবি বিজয় গুপ্ত লিখেছেন 'পট্টবস্ত্র পরিধান বড় দেখি শোভা।/একে চাপে চলিয়াছে দুই শত ধোপা॥'[৪২] আরো বলছেন- 'পদ্মাবতীর অধিবাস কৌতুক অপার। ধোপায় যে ছোয়ায় ক্ষার লোক ব্যবহার॥'[৪৩] তবে আরো পূর্বে চৌদ্দ শতকের কবি বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ

---

[৩৫] কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ, *মনসা-মঙ্গল*, প্রথম খণ্ড (যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য সম্পা.), (কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৩), পৃ. ২৯৮ ও ২৯৯।

[৩৬] ভারতচন্দ্র রায়, *অন্নদামঙ্গল*, (কলিকাতা: প্র. নে., ১৭৭৫ শক), পৃ. ১২০।

[৩৭] 'সাবান', *বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান (তৃতীয় খণ্ড, ভ-হ)*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৪)।

[৩৮] *বাংলা একাডেমি ব্যাবহারিক অভিধান*।

[৩৯] মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চন্ডীমঙ্গল* (সম্পা. সুকুমার সেন), (নতুন দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৩), পৃ. ৮৩।

[৪০] *ঐ*, পৃ. ১২৩।

[৪১] Abul Fazl- I-'Allami, *'Ain-I-Akbari*, Vol. II, (Tran. H.S. Jarrett), (Calcutta: Royal Asiatic Society of Bengal, 1949), p. 136.

[৪২] বিজয় গুপ্ত, *পদ্মপুরাণ বা মনসা মঙ্গল* (বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য সং.), কলিকাতা: শুধাংশ সাহিত্য মন্দির, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৭৯।

[৪৩] *ঐ*, পৃ. ২৪।

ধোপানি অর্থে রজকিনিকে বলছেন 'শুন রজকিনি রামি'[৪৪]। তিনি ধোপা অর্থে বলছেন 'বিশুদ্ধ রতিতে কারণ কি।/ সাধহ সতত রজক-ঝি॥'[৪৫] সমসাময়িক রচনা (১২-১৪ শতক) *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*-এ বলা হয়েছে, করণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে তক্ষা ও রজক (ধাপা) জাতির উৎপত্তি, যাঁরা ছিলেন মধ্যম-সংকর বর্ণের মানুষ[৪৬], তবে একই সময় (১২-১৪ শতক) রচিত *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*-এর হিসেবে ধোপা ছিলেন অসৎশুদ্র পর্যায়ভুক্ত। এই গ্রন্থে অন্যত্র বলা হয়েছে কৃষ্ণের জন্মদিনে যে ভোজন করবে সে ধোপা বা রজক হিসেবে জন্মাবে। এই রচনার শ্রীকৃষ্ণেরজন্মখণ্ডের ৫১ তম অধ্যায়ে রজক-নিগ্রহের কথাও বলা হয়েছে।[৪৭] রাজা লক্ষণ সেনের সভা কবি গোবর্ধন আচার্য রচিত (১২ শতক) *আর্যসপ্তশতী* কাব্য গ্রন্থে বস্ত্র ধোয়ার কাজে রজক-গৃহিনীর অসতার কথাও উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে তাঁরা অপরের অধৌত মলিন বস্ত্র পরিধান করত, সে পোশাকের প্রতি তাঁদের মায়া ছিল না (৪০২)। এমনকি অর্থের বিনিময়ে প্রেমিকাকে প্রেমিকের বস্ত্র দিয়ে দিত (শ্লোক ৯০)।[৪৮] জ্ঞাত-তথ্য মতে এরচেয়ে প্রাচীন তথ্য সাহিত্যে সূত্রে পাওয়া যায় না। তবে সিলেট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত (আনুমানিক) ১০৪৯ খ্রিস্টাব্দে রচিত গোবিন্দ কেশবদেবের তাম্র-লিপিতে গ্রামের একজন ধোপার নাম পাওয়া যায়। তাঁর নাম সিরূপা।[৪৯] এসব তথ্যদৃষ্টে এটা সহজেই অনুমেয় যে, সমকালে পোশাক-পরিচ্ছদ ধোয়ার জন্য সমাজে ধোপা পেশাজীবীর সরব উপস্থিতি ছিল।

আলোচনার এই পর্যায়ে বলা যায় ভারত অঞ্চলে মধ্যযুগে কেক-সাবানের প্রচলন শুরু হলেও বাংলায় তা ঔপনিবেশিক যুগের আগে তার ব্যবহার ব্যাপক বিস্তৃত ছিল না। কারণ সাহিত্যিক উৎসে বস্ত্র ধোয়া এবং পেশা হিসেবে ধোপার উল্লেখ বারংবার পাওয়া গেলেও সাবানের উল্লেখ নাই। তবে বাংলা অঞ্চলে প্রচুর স্থান-নাম আছে যা ধোপার সাথে সংশ্লিষ্ট।[৫০] তাই সার্বিকভাবে বলা যায় পোশাক-পরিচ্ছদ ধোয়ার ব্যবস্থা বাংলা অঞ্চলে

---

[৪৪] শুন রজকিনি রামি।/ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া/ শরণ লইনু আমি॥/ বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে/ ধোপানী-চরণ সার॥ নীলরতন মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), *চণ্ডীদাসের পদাবলী*, (কলিকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, ১৩২১ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৩৩২।

[৪৫] *ঐ*, পৃ. ৩৩১।

[৪৬] পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা. ও অনু.), *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম্*, (কলিকাতা: কেবলরাম চট্টোপাধ্যায়, ১৩০০), পৃ. ২৩৬।

[৪৭] সুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পা. ও অনু.), *শ্রীশ্রীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*, (কলিকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর, ১৩৬০), পুনর্মুদ্রণ, পৃ. ৩০ (ব্রহ্মখণ্ড), ১৪৫, ১৫৪, ১৫৬, (প্রকৃতিখণ্ড), ৩২৯, ৫০০, ৫০৭ (শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড)।

[৪৮] জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *আর্যসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ*, (কলকাতা: সান্যাল এন্ড কোম্পানী, ১৩৬৭), পৃ. ২৩৬ ও ১৬৩।

[৪৯] 'The Bhatera Copper-Plate Inscription of Govinda-kesavadeva', *Epigraphia Indica, Vol. XIX* (1927-28), p. 286.

[৫০] যেমন- ধোলাই খাল (ঢাকা সদর), ধোপাপাড়া (পুঠিয়া, রাজশাহী; বন্দর চট্টগ্রাম; কাশিয়ানি, গোপালগঞ্জ), ধুপিপাড়া (পার্বতীপুর, দিনাজপুর), ধোপা দীঘি (সিলেট সদর), ধোপাপুকুর (সাতক্ষীরা সদর), ধোপাবাড়ি (শাহরাস্তি, চাঁদপুর) সহ অসংখ্যা উদাহরণ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও ধোপাগ্রাম ও ধোবাগ্রাম নামে গ্রাম রয়েছে। দেখুন, অমলেন্দু মিত্র, *রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর*, (কলিকাতা, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭২), পৃ. ১৫১।

বিদ্যমান ছিল তা স্পষ্ট হয়েছে। তবে শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদ ধোয়ার জন্য মূলত ক্ষার, খৈল, সাজিমাটি প্রভৃতি দিয়ে সম্পন্ন হতো।

প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে প্রাচীন যুগের আগে বাংলা অঞ্চলে পোশাক ধৌতকরণে কী ব্যবস্থা ছিল? অথবা উল্লিখিত ক্ষার কী উপায়ে পাওয়া যেত? এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর অন্বেষণের জন্য নিকট অতীতে ক্ষার উৎপাদনে গ্রামীণ ঐতিহ্যের প্রতি আলোকপাত করা যেতে পারে। বাংলা অঞ্চলে সনাতন পদ্ধতিতে শরীর, চুল ও বস্ত্র ধৌতকরণের প্রধানত তিনটি উপায় ছিল।

এক. গুল্ম-লতার রস ও ফলের ব্যবহার। এধরনের উদ্ভিদ মূলত fuller's herb বা fuller's plant হিসেবে হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে এধরনের উদ্ভিদের অভাব ছিল না- তা ঔপনিবেশিক সূত্রে ইতোমধ্যে স্পষ্ট হয়েছে। আঠারো শতকের শেষ দিকে বম্বে থেকে রয়াল সোসাইটির প্রেসিডেন্টকে হেলেন স্কট বস্ত্রশিল্পে উদ্ভিজ্জ উপকরণ ব্যবহারে ভারতীয়দের দক্ষতার ভূয়সী প্রসংশা করেছেন।[৫১] এরকম একটি বৃক্ষ রিঠা বা রিটা। প্রায় সব অভিধান রিঠাকে কাপড় কাচার জন্য ব্যবহৃত ছোট ফল হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বৃক্ষ-বিশেষজ্ঞ মোকারম হোসেন লিখেছেন– রিঠার বীজ পানিতে ভিজিয়ে রাখলে ফেনা হয়। উলের তৈরি পোশাক পরিষ্কারের জন্য এই ফেনা উত্তম। এখনো দেশের কোথাও কোথাও এ পদ্ধতিতে কাপড় ধোয়া হয়। বিউটি পারলারগুলোতেও শ্যাম্পুর বিকল্প হিসেবে চুল ধোয়ার কাজে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। রিঠার ইংরেজি নাম Soap Plant, মানে সাবানগাছ। অন্যান্য নামের মধ্যে আছে Soap Nut, Soap Berry, Wash Berry ইত্যাদি। এরা উত্তর ভারত ও হিমালয়ের প্রজাতি। এই গাছের প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ১৩। Sapindus mukorossi ছোট জাতের রিঠা। সাধারণত এ প্রজাতিটিই বাগানে রোপণ করা হয়।[৫২] এখনও ঢাকায় মিরপুরের 'বানিয়া'র দোকানে রিঠা পাওয়া যায়। এছাড়া *Sapindaceae* পরিবারের অন্যান্য সোপ নাটও বাংলায় পাওয়া যেত।[৫৩] বাংলাদেশের পাবনা অঞ্চলে তিলের তাজা পাতা ভেজা মাথায় ঘষে ফেনা তৈরি করে চুল পরিষ্কার করার রীতি প্রচলিত ছিল।[৫৪] পি. কে. গোড এরূপ আরো কিছু বৃক্ষের নাম উল্লেখ করেছেন, যেমন- Sapindus, Energinata, Maduriensis, Saponarius, Senegalensis.[৫৫]

দুই. নিকট অতীত পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এক ধরনের মাটি মাথায় মেখে চুল পরিষ্কার করা হতো। লেখক নিজেও তিন দশক পূর্বে গ্রামে অন্যদের সাথে মাটি ব্যবহার করেছেন। বাংলা অভিধানসমূহে এবং সাহিত্যে সাজিমাটির এই ব্যবহার উল্লিখিত হয়েছে। উল্লেখ্য সাজিমাটি এক ধরনের ক্ষারজাতীয় মাটি যে মাটির পিএইচ মান ৭.৪ বা তার বেশি। জানা যায় পাবনা

---

[৫১] সুমিত দাস, *ভারত থেকে ম্যাঞ্চেস্টার: প্রথম বিশ্বায়িত পণ্য- সুতিবস্ত্র*, (কলকাতা: পিপলস্ বুক সোসাইটি, ২০২০), পৃ. ৭৩।

[৫২] মোকারম হোসেন, 'সাবানের গাছ', *দৈনিক সমকাল*, ঢাকা, ২৪ নভেম্বর ২০১৯, শেষ পৃষ্ঠা।

[৫৩] 'Sapindus Laurifolius', C.P. Khare (ed.) *Indian Medicinal Plants*, (New York: Springer, 2007).

[৫৪] মো. মারুফ বিল্লাহ (৪৫), উত্তর শোলাবাড়িয়া, সাঁথিয়া, পাবনা, তারিখ: ০৮/০৫/২০২৩।

[৫৫] P. K. Gode, *Studies in Indian Cultural History*, Vol. III, (Poona: B. O. R. Institute, 1969), p. 150.

অঞ্চলে চুল পরিষ্কারের জন্য উঁইয়ের মাটিও (বাসা) ব্যবহৃত হতো।[৫৬] নিকট অতীতের মতো দূর অতীতেও সারা বাংলাসহ ভারত ও বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে ক্লিনিং এজেন্ট হিসেবে এই মাটি ব্যবহৃত হতো। সম্ভবত মিশরীয়রাও কাপড় ধোয়ার জন্য এধরনের মাটি (Fuller's earth) ব্যবহার করত।[৫৭] একই কাজে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দ থেকেই ব্যবলীয়ানরাও ডিটারজেন্ট হিসেবে বিশেষ ধরনের মাটি ব্যবহার করত।[৫৮] ঔপনিবেশিক সূত্রে জানা যায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় লুনাভাদা ও বালাসিনোরে সাবান উৎপাদনে এই মাটি ব্যবহৃত হতো। এসব সাবান কাপড় কাচার জন্য অধিক ব্যবহৃত হতো।[৫৯] ঢাকার সিভিল সার্জন জেমস ওয়াইজও বাংলায় সাবান হিসেবে সাজিমাটির ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন।[৬০]

তিন. শুধু মাটি না কিছু লতা-পাতা ও বৃক্ষ থেকে উৎপন্ন ছাইও ক্লিনিং এজেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ছাই থেকেই মূলত প্রকৃতিক ক্ষার তৈরি করা হতো। উদ্ভিজ্জ ছাই থেকে পাওয়া যায় বলে সোডিয়াম কার্বনেট সোডা অ্যাশ নামেও পরিচিত হওয়ার কারণ। ইতোমধ্যে ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক ক্ষার ব্যবহারের অনেক নজির উল্লেখ করা হয়েছে। লেখক সুমিত দাসও প্রাকৃতিক ক্ষার ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন।[৬১] গবেষক কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার সূত্রেও[৬২] জানা যায় হলুদ, কলা ও সরিষার গাছ শুকানোর পর পুড়িয়ে তা থেকে উৎপন্ন ছাই হতে ক্ষার তৈরি করার রেওয়াজ বাংলায় প্রচলিত ছিল।

হলুদ, কলা ও সরিষার গাছ ছাড়াও শিমুল ফুল থেকে উৎপন্ন ছাই ব্যবহার করেও ক্ষার তৈরি করা হয়। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে একটি এনজিও'র মাসিক প্রচারপত্র সূত্রে জানা যায়, নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলার কিসমত আড়া গ্রামের জহুরা বেগম তখন পর্যন্ত কাপড় কাচার কাজে শিমুল ফুলের ক্ষার ব্যবহার করতেন। জহুরা বেগমের মতে রং ওঠার ভয় নাই এমন অধিক ময়লাযুক্ত কাপড় পরিষ্কারের জন্য এই ক্ষার অধিক কার্যকর। তাঁর মতে কাপড় কাচার সাবান অথবা সোডার চাইতেও এর কাপড় পরিষ্কার করার ক্ষমতা অনেক বেশি।[৬৩]

---

[৫৬] মো. মারুফ বিল্লাহ (৪৫), উত্তর শোলাবাড়িয়া, সাঁথিয়া, পাবনা, তারিখ: ০৮/০৫/২০২৩।

[৫৭] Martin Levey, 'The Early History of Detergent Substances: A Chapter in Babylonian Chemistry', *Journal of Chemical Education*, vol. 31, 1954, p. 522.

[৫৮] *Ibid.*

[৫৯] *Gazetteer of the Bombay Presidency, Vol. VI (Rewa Kanta, Narukot, Cambay and Surat)*, (Bombay: Government Central Press. 1880), pp. 57 & 58.

[৬০] জেমস ওয়াইজ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৫।

[৬১] সুমিত দাস, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭২।

[৬২] মোঃ ফক্রুল ইসলাম (৫৮), চৌহালী, সিরাজগঞ্জ, তারিখ: ২২/১১/২০২১; মনোয়ারা বেগম (৫৫), মিরপুর-১, ঢাকা, তারিখ: ০২/০১/২০১৪; হামিদা খাতুন (৫২), মালাহার, ধামইরহাট, নওগাঁ, তারিখ: ১৫/০৩/২০১৭; ছহিরন নেছা (৮৫), টেগরা, বিরামপুর, দিনাজপুর, তারিখ: ০৭/১০/২০১৫; মো. মারুফ বিল্লাহ (৪৫), উত্তর শোলাবাড়িয়া, সাঁথিয়া, পাবনা, তারিখ: ০৮/০৫/২০২৩।

[৬৩] হেপী রায়, 'প্রাকৃতিক সাবান শিমুল ফুল', *আমাদের পরিবেশ*, মার্চ ২০১৪, বর্ষ ১৪, সংখ্যা ৩, পৃ. ৫।

সাক্ষাৎকার দাতাদের ভাষ্যমতে, ক্ষার তৈরির জন্য সাধারণত হলুদ, কলা ও সরিষা গাছ ভালো করে শুকিয়ে সারা বছরের জন্য সংরক্ষণ করা হতো। লক্ষণীয় বিষয় বর্ষার পূর্বে এই সংরক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হতো। বৃষ্টিতে এর গুণাগুণ হ্রাস পায় বলে ভালো করে ঢেঁকে রাখা হয়। এরপর প্রয়োজন অনুসারে চুলায় রান্নার কাজে জ্বালানী হিসেবে শুকনা কলা বা সরিষার গাছ পোড়ানো হয়। এরপর আগুন নিভিয়ে গেলে সেই ছাই সাধারণত মাটির পাত্রের পানিতে ভেজানো হয়। ঘন্টা খানেক সময় পর পানি থেকে ছাই পৃথক করা হয়। কার্যত এই পানিই ক্ষার দ্রবিভূত পানি। এই পানিতে কাপড় ভিজিয়ে রাখতে হয়। এরপর কাপড় তুলে নতুন পানিতে আছাড় দিয়ে ধুয়ে নিলেই পরিষ্কার কাপড় পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত নেত্রকোণার আটপাড়া উপজেলার কিসমত আড়া গ্রামের জহুরা বেগমসূত্রে জানা যায়, শিমুল ফুলের ছাই থেকে মণ্ড তৈরি করে তা সারা বছরের জন্য সংরক্ষণও করা যায়। এজন্য প্রথমে শিমুল ফুল রৌদ্রে ভালো করে শুকিয়ে চুল্লিতে পোড়ানো হয়। এই ছাই অল্প একটু চুন দিয়ে বা চুনের পানি দিয়ে মণ্ড বানিয়ে কাগজে মুড়িয়ে মাটির হাঁড়িতে বা অন্যকোন পাত্রে বায়ুরোধক অবস্থায় শুষ্ক কোন জায়গায় রেখে দিতে হয়। বাতাস লাগলে এর কাপড় পরিষ্কার করার ক্ষমতা বা গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। শুষ্ক ও বায়ুর সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকলে এই মণ্ড অনেকদিন সংরক্ষণ করা যায়। পরে প্রয়োজন মতো নিয়ে কাপড় ধোয়ার জন্য ব্যবহার করা যায়। কাপড় কাচার জন্য প্রথমে পানি খুব ভালোভাবে গরম করে অল্প পরিমাণ যেমন এক মুঠো মণ্ড সেই পানিতে গুলে নিতে হয়। মণ্ডটি ভালোমতো পানিতে মিশে গেলে আরো কিছুক্ষণ জ্বাল করে তাতে ময়লা কাপড়গুলো ভিজিয়ে রাখতে হয়। মূলত এসব কাপড় এক ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপর তুলে নিয়ে ভালো করে আছড়ে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিলেই পাওয়া যায় কাঙ্ক্ষিত পরিষ্কার কাপড়।[৬৪]

ঔপনিবেশিক দলিল, বাংলা সাহিত্য, তাম্রলিপি প্রভৃতির তথ্য মতে বাংলা অঞ্চলে পোশাক-পরিচ্ছদ ধোয়ার জ্ঞান-প্রযুক্তি ও ব্যবস্থার এই ঐতিহ্যের প্রাচীনত্ব সর্বাতীত একাদশ শতক পর্যন্ত প্রমাণিত হয়। জ্ঞাত তথ্যমতে এ সম্পর্কে এর চেয়ে প্রাচীন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে পোশাক-পরিচ্ছদ ও শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সংস্কৃতির আরো অতীতের ইতিহাস অন্বেষণ করা অসম্ভব নয়। এ বিষয়ে বাংলা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত তথ্য ও সামাজিক ব্যাখ্যা বিশেষ সাহায্য করতে পারে। যেমন:

কলা: সংস্কৃত কদলক প্রকৃত হয়ে বাংলা ভাষায় কলা রূপে গৃহীত হয়েছে। পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকে ও নানান প্রস্তরচিত্রে প্রায়ই ফলসহ বা ফল ছাড়া কলাগাছের চিত্র দৃষ্ট হয়। আদি অস্ট্রেলীয় কাল থেকেই কলা বাঙালির প্রিয় খাবার।[৬৫] *শূন্যপুরাণ*-এও কলা (অথ বৈতরণী, ৪; অথ চাস, ১৩) উল্লিখিত হয়েছে।

---

[৬৪] হেপী রায়, 'প্রাকৃতিক সাবান শিমুল ফুল', *আমাদের পরিবেশ*, মার্চ ২০১৪, বর্ষ ১৪, সংখ্যা ৩, পৃ. ৫।

[৬৫] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদিপর্ব*, (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৪৩।

তিল: এক প্রকার তৈলবীজ। তিল শব্দও আর্যপূর্ব দ্রাবিড় উৎস হয়ে বাংলায় এসেছে। শব্দটি দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর তামিল, মলয়ালম, কন্নড় ভাষাতে সমার্থক শব্দ হিসেবে গৃহীত হয়েছে।[৬৬]

সরিষা: বাংলা অভিধান মতে সরিষা শব্দ সংস্কৃত সর্ষপ থেকে উদ্ভূত। সরিষা শব্দ *অর্থশাস্ত্র* ও *অভিধানরত্নমালা*-তে উল্লিখিত হয়েছে। ১ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীর লেখক ব্যৎসায়নও সরিষা চাষের কথা উল্লেখ করেছেন।[৬৭] *অর্থশাস্ত্র*-এ শস্যের নামের তালিকায় সরিষার (sarshapa) উল্লেখ রয়েছে।[৬৮] ছয় শতকের *অমরকোষ*-এ সরিষা শব্দ পাওয়া যায়।[৬৯] পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত সাত শতকের জয়নাগের বপ্পঘোষবাট তাম্রলিপির দশম লাইনে সরিষা উল্লিখিত হয়েছে।[৭০] এছাড়া খনার বচনেও সরিষা চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায়।[৭১] আনুমানিক ১২০০ খ্রিস্টাব্দে রচিত কেদারভট্টের *বৃত্তরত্নাকর*-এও সরিষা শাকের কথা উল্লিখিত হয়েছে।[৭২] দশম শতাব্দীর *অভিধানরত্নমালা*-তে সরিষার উল্লেখ রয়েছে।[৭৩] রাজশেখর (সাহিত্যিক জীবন ৮৮০-৯২০ খ্রিস্টাব্দ[৭৪]) রচিত *কাব্য-মীমাংসা* গ্রন্থে কলা, সরিষা প্রভৃতি উল্লিখিত।[৭৫] *শূন্যপুরাণ*-এও সরিষার কথা আছে (অথ চাস, ১১)। ১১০০ খ্রিস্টাব্দে আচার্য বিদ্যাকর কর্তৃক সংকলিত

---

[৬৬] তপতী রানী সরকার, *বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার: অনার্যভাষী জনগোষ্ঠীর প্রভাব*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১৩), পৃ. ২৪৪।

[৬৭] R. Shamasastry (tran.), *Kautilya's Arthasastra*, (Mysore: The Wesleyan Mission Press, 1929), p. 128; T. H. Aufrecht (ed.), *Halayudha's Abhidhanaratnamala*, London, 1861: 154, 165, 321, 349 and 377; Richard Burton & F. F. Arbuthnot (Tran.), *The Kama Sutra of Vatsyayana*, (London: George Allen & Unwin, 1985), p. 197.

[৬৮] R. Shamasastry (tran.), *op.cit.*, p. 128

[৬৯] *অমরকোষ* (মদ্গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য সম্পা.), ২য় কাণ্ডে বৈশ্যবর্গঃ ৪০-৭১, (কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২৫৮-২৬১।

[৭০] জয়নাগের বপ্পঘোষবাট তাম্রলিপির দশম লাইনে এর উল্লেখ রয়েছে। সূত্র: 'Vappaghoshavata Grant of Jayanaga', *Epigraphia Indica*, Vol. XVIII (1925-26), (New Delhi: Archeological Survey of India, 1983), p. 63.

[৭১] যেমন: সরিষা বনে কলাই মুগ, বুনে বেড়াও চাপড়ে বুক ॥ খনা বলে চাষার পো, শরতের শেষে সরিষা রো ॥ সূত্র: *খনার কৃষি ও ফল সংক্রান্ত বচন*, ঢাকা: নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ২০১১, পৃ. ৭০ ও ৭৩; ঘন সরিষা পাতলা রাই, নেংগে নেংগে কার্পাস পাই ॥ সূত্র: তুষার কান্তি পাণ্ডে (সম্পা.), *চাণক্য শ্লোক, সাতশ প্রবাদ ও খনার বচন*, (কলকাতা: গ্রন্থনা, ২০০২), পৃ. ৪৫।

[৭২] Taponath Chakravarty, *Food and Drink in Ancient Bengal*, (Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyay,1959), p. 13.

[৭৩] *Halayudha's Abhidhanaratnamala* (ed. T. H. Aufrecht), (London: Williams & Norgate, 1861).

[৭৪] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন: J. F. Fleet, 'The Date of the Rajasekhara', pp. 175-178.

[৭৫] নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, *রাজশেখর ও কাব্য-মীমাংসা*, (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৬০), পৃ. ১৭৮-১৮০।

সুভাষিতরত্নকোষ[৭৬]-এ পাঁচজন কবির অন্তত আটটি শ্লোকে সরিষা গাছ, সরিষা ফুল, সরিষার মাঠ, সরিষার তেল প্রভৃতি প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে।[৭৭]

শিমুল: সংস্কৃত শাল্মলী থেকে বাংলা শিমুল শব্দের উৎপত্তি। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ (Silk cotton, Red Silk-Cotton, Red Cotton Tree) ও গণ ও প্রজাতির নাম (Bombax buonopozense, Bombax ceiba, Bombax costatum Pellegr, Bombax insigne, Bombax mossambicense) দৃষ্টে মনে হয় শিমুল শব্দটিও স্থানীয়।

কাচা (কাপড়): ক্ষার জলে কাপড় সিদ্ধ করে বারংবার ওপরে তুলে আছড়ানো অর্থে 'কাচাও' শব্দ অস্ট্রিক ভাষার সাঁওতালি শব্দ। এই কাচাও থেকে বাংলা কাচা শব্দের ব্যুৎপত্তি।[৭৮]

ধোওয়া, ধোয়া, ধোপা, ধোবা, ধোলাই: সংশ্লিষ্ট এই শব্দসমূহ দ্রাবিড় ভাষাজাত।[৭৯]

সাজি (মাটি): মলিন বস্ত্রাদি ধৌত করার পক্ষে উপযুক্ত ক্ষারযুক্ত (মাটি) অর্থে এটি অস্ট্রিক ভাষার গোষ্ঠির সাঁওতালি শব্দ, যা সরাসরি বাংলা ভাষায় আজও ব্যবহৃত হয় পূর্ণাঙ্গ রূপে।[৮০]

ক্ষার: সাঁওতালি শব্দ খর ও খরা এই শব্দদ্বয়ের অর্থ পোড়ানো এমন, পোড়া স্বাদযুক্ত, তিক্ত, রুক্ষ, ক্ষারজাতীয়, লবণাক্ত। বাংলা ক্ষার শব্দও সাঁওতালি খর বা খরা থেকে বাংলায় প্রবেশ করেছে।[৮১]

খইল: বাংলা একাডেমির অভিধান মতে শব্দটি খইল ছাড়াও খৈল ও খোল বানানেও প্রচলিত রয়েছে। যার অর্থ তিল, সরিষা প্রভৃতি থেকে তেল বের করার পর যা অবশিষ্ট থাকে। শব্দটির উৎপত্তি নির্দেশ করা হয়েছে সংস্কৃত খলি শব্দ থেকে। একই মত প্রকাশ করেছেন অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ।[৮২] তবে শব্দটি মনে হয় আরো প্রাচীন উৎসজাত। ক্ষুদিরাম দাশ জানিয়েছেন অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর সাঁওতালি ভাষায় খাঁড়ি থেকে খলি ও খইল শব্দের উৎপত্তি। খাঁড়ি শব্দের অর্থও একই: তেলের ঘানি পিষ্ট ও বর্জিত অংশ।[৮৩]

---

[৭৬] নওগাঁ জেলার ধামইরহাট থানার জগদ্দল মহাবিহারে বসে এই বৌদ্ধ পণ্ডিত আট থেকে এগারো শতকের দুইশতাধিক কবির ১৭৩৮টি শ্লোক সংকলন করেন। মূলত এ সংকলনই *সুভাষিতরত্নকোষ* নামে পরিচিত। দেখুন: Daniel H. H. Ingalls (Tran.), *An Anthology of Sanskrit Court Poetry: Vidyākara's "Subhāṣitaratnakoṣa"*, (Cambridge: Harvard University Press, 1965), p. v (Preface).

[৭৭] Daniel H. H. Ingalls (Tran.), *An Anthology of Sanskrit Court Poetry: Vidyākara's "Subhāṣitaratnakoṣa"*, (Cambridge: Harvard University Press, 1965), V. 296, 297, 315, 316, 318, 321, 1184 & 1296.

[৭৮] 'কাচাও', *সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান* (সংকলন ক্ষুদিরাম দাশ), (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮)।

[৭৯] 'ধোওয়া', সত্যনারায়ণ দাশ, *বাংলায় দ্রাবিড় শব্দ (ব্যুৎপত্তিকোষ)*, (কলিকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৩)।

[৮০] 'সাজি মাটি', *সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান* (সংকলন ক্ষুদিরাম দাশ), *পূর্বোক্ত*।

[৮১] 'খর$_২$, খরা', *সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান* (সংকলন ক্ষুদিরাম দাশ), *পূর্বোক্ত*।

[৮২] ওয়াকিল আহমদ, *লোকজ্ঞান*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬।

[৮৩] 'খাঁড়ি', *সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান* (সংকলন ক্ষুদিরাম দাশ), *পূর্বোক্ত*।

সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের উপর্যুক্ত ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা শব্দসমূহের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। এটা সর্বজন স্বীকৃত যে জ্ঞাত তথ্যমতে বাংলা অঞ্চলে প্রথম বসতি স্থাপনকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে অস্ট্রিক-দ্রাবিড়রা ছিলেন প্রধান।[৮৪] আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের[৮৫] দিকে উত্তর ভারতে আগমনের অনেক পরে আর্যরা বাংলায় প্রবেশ করে। গুপ্তযুগের পূর্বে[৮৬] বাংলা অঞ্চলে আর্যদের অনুপ্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত অস্ট্রিক-দ্রাবিড়রাই ছিলেন প্রধান জনগোষ্ঠী।[৮৭] এদের ভাষা যথাক্রমে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষা নামে পরিচিত। অস্ট্রিক ভাষার বর্তমান প্রতিভূ হচ্ছে মুণ্ডারি ভাষা– যে ভাষা সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোরওয়া, কোরবু প্রভৃতি জাতিসমূহ ব্যবহার করে থাকে।[৮৮] অপর দিকে দ্রাবিড় ভাষার উত্তরসূরী হলো: গোণ্ড, মালের, কুই (খন্দ), ওরাওঁ (কুড়ুখ) ভাষা।[৮৯] আর যেহেতু শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদ ধোয়ার সনাতন সংস্কৃতির একাধিক শব্দ আর্যপূর্ব ভাষাগোষ্ঠী হতে আগত, তাই বলা যেতে পারে স্থানীয়ভাবে ক্ষার উৎপাদন-প্রযুক্তি ও ব্যবহার সংস্কৃতির সাথে আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রগাঢ় সম্পর্ক রয়েছে।[৯০] সকলেই অবগত

---

[৮৪] অতুল সুর, *বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, (কলিকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৭৭, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২৪; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা*, (কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৪), পৃ. ৭৬।

[৮৫] সুকুমারী ভট্টাচার্য, *প্রাচীন ভারত*, (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি., ২০০৯), পৃ. ১১; অতীন্দ্র মজুমদার, *মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা ও সাহিত্য*, (কলিকাতা: নয়া প্রকাশ, ১৪০৪), পৃ. ৩।

[৮৬] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস প্রথম খণ্ড [প্রাচীন যুগ]*, (কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯২), পৃ. ২৪।

[৮৭] মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১০), পৃ. ৫৮; আবদুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, মার্চ ২০১২), পৃ. ৯৯।

[৮৮] নীহাররঞ্জন রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২; অতুল সুর, *বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, (কলিকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৭৭), পৃ. ২৬।

[৮৯] কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য, 'প্রাক্ কথন', *তরাই-ডুয়ার্সের লোকায়ত শব্দকোষ* (সং ও সম্পা. কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য), (কলকাতা: প্যাপিরাস, ২০০৬, পৃ. ৩১।

[৯০] ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেছেন- "[বাংলার] দৈনন্দিন জীবনের প্রাচীনতম আভাস অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষার এমন সব শব্দের মধ্যে পাওয়া যাবে, যে-সব শব্দ ও শব্দ-নির্দিষ্ট বস্তু আজও আমাদের মধ্যে কোনও না কোনও রূপে বর্তমান। এ ধরনের কিছু শব্দে আমাদের আহার-বিহার, বসন-ভূষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত এ সুদীর্ঘ শব্দেতিহাসের মধ্যে পাওয়া যাবে। এ হিসেবে এ শব্দগুলিই আমাদের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক উপাদান এবং নির্ভরযোগ্য উপাদানও বটে।" তিনি এসব 'অন্য উৎস' ব্যবহার করে বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নতুন দিক উন্মোচনের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। তিনি প্রাচীন বাংলার গণনারীতি, বিভিন্ন ফসল ও তরিতরকারির নাম, স্থান-নাম, বাঙালীর প্রধান খাদ্য প্রভৃতির বর্ণনা দিয়েছেন 'প্রাচীনতম ঐতিহাসিক' ও 'নির্ভরযোগ্য' উপাদান অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী ব্যবহৃত শব্দের ভিত্তিতে। এ ক্ষেত্রে তিনি শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক ও ব্যুৎপত্তিগত (Etymology) তথ্য বা ব্যাখ্যা ব্যবহার করেছেন। দেখুন, নীহাররঞ্জন রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩, ৪৯, ৫১, ৪৪২, ৪৪৩ ও ৪৪৭। শুধু ঐতিহাসিক রায় নয়

যে, বাংলা অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষীদের বিস্তার ঐতিহাসিকযুগের পূর্বেই সূচিত হয়েছে। এসব সম্পর্কের সূত্র ধরে এ অনুমান অমূলক নয় যে, মধ্যযুগের ন্যায় প্রাচীন যুগে এবং তারও পূর্বে বাংলা অঞ্চলের মানুষ হলুদ, সরিষা, কলা প্রভৃতির গাছ হতে ক্ষার প্রস্তুত করতে কার্যকর প্রযুক্তির ব্যবহার জানত। পাশাপাশি খৈল ও সাজিমাটি প্রভৃতির ব্যবহারও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।

পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বের অন্যত্র অনেক পূর্বেই পরিষ্কার করার উপকরণ হিসেবে সাবান ব্যবহৃত হলেও ভারতে বিশেষত বাংলা অঞ্চলে সাবানের প্রচলন হয়েছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে। এমনকি মধ্যযুগে দিল্লি-আগ্রা কেন্দ্রিক শাসকদের অধীনে সাবান উৎপাদন ও বিপণন শুরু হলেও বাংলা অঞ্চলে মনে হয় তখনও জনসাধারণের মধ্যে সহজলভ্য ছিল না। ঔপনিবেশিক সময়ে বাণিজ্যিকভাবে সাবান উৎপাদন শুরু হলে চাহিদা বাড়ে। তবে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, বাংলার অধিকাংশ মানুষের সাথে সেই সাবানের সংশ্লেষ ছিল না। কারণ হিসেবে দামের ভূমিকা অস্বীকার না করেই বলা চলে শরীর, চুল ও বস্ত্র পরিষ্কার করার কার্যকর ব্যবস্থা বাংলার মানুষের জানা ছিল। এর ঐতিহাসিক সত্যতা পাওয়া গেছে ঔপনিবেশিক দলিলপত্রে, মধ্যযুগের সাহিত্যে, অভিধানে, ও রাজকীয় দলিলে। এমনকি প্রাচীন যুগের তাম্রলিপিতেও স্পষ্ট ইংগিত রয়েছে। এসব প্রমাণে নিশ্চিত করেই বলা চলে বাংলার ঐতিহ্যবাহী ধৌতকরণ ব্যবস্থা ও প্রযুক্তি মধ্য যুগেও মানুষের প্রয়োজন মেটাত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলায় উৎপাদন ব্যবস্থায় বাইরের কোন প্রভাব পড়েনি।[৯১] এই প্রেক্ষাপটে মনে হয় বাংলার সনাতন পরিষ্কারকরণ সংস্কৃতি আরো প্রাচীন। আর যেহেতু বাংলা অঞ্চলের সনাতন পরিষ্কারকরণের উৎস-উপকরণ– হলুদ, তিল, কলা, সরিষা প্রাচীন কাল থেকেই সুলভ ছিল; অন্তত– তিল, কাচা,

---

অন্যরাও এরূপ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। যেমন, Franklin C. Southworth রচনা করেছেন *Linguistic Archaeology of South Asia* (London & New York: RoutledgeCurzon, 2005)। শব্দের ব্যুৎপত্তির বিশ্লেষণের প্রতি ঐতিহাসিক ইরফান হাবিবও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, ইরফান হাবিব, *সিন্ধু সভ্যতা* (অনু. কাবেরী বসু), (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি., ২০০৯), ১১২-১১৬। শব্দ কিভাবে 'source of clues' হতে পারে সে বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, David W. Anthony, *The Horse, the Wheel, and Language: How Bronze-Age Riders from the Eurasian Steppes Shaped the Modern World,* (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2007), বিশেষত দ্বিতীয় অধ্যায় (পৃ. ২১-৩৮)। এমনকি বিশ্বে সাবানের ইতিহাসও অন্বেষণ করা হয়েছে শব্দের ব্যুৎপত্তি তথ্য ব্যবহার করে। যেমন বলা হয়েছে, মিশরীয়, সুমেরিয়ান এবং আক্কাদিয়ান ভাষায় সাবান অর্থে Soap শব্দ অনুপস্থিত। তবে আরবি, ল্যাটিন, তুর্কি, গ্রীক, ফার্সি, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ফিনিশ, হাঙ্গেরিয়ান, ডাচ, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় Soap শব্দ বহুল ব্যবহৃত এবং একই শব্দমূল থেকে জাত। সূত্র: Martin Levey, 'The Early History of Detergent Substances: A Chapter in Babylonian Chemistry', *Journal of Chemical Education*, vol. 31, 1954, p. 521.

[৯১] নীহাররঞ্জন রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০৬-৩০৭।

ধোওয়া, ধোয়া, ধোপা, ধোবা, ধোলাই, সাজি (মাটি), ক্ষার, খৈল শব্দসমূহ আর্যপূর্ব ভাষাগোষ্ঠী হতে আগত এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই সনাতন পরিষ্কারকরণ প্রযুক্তি বা সংস্কৃতির সাথে আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রগাঢ় সম্পর্কের অনুমান অমূলক নয়। সম্ভবত নিকট অতীতের রীতি অনুসারে স্থানীয় উপকরণে ও পারিবারিক পর্যায়ে বা ক্ষুদ্র আয়োজনে ক্ষার উৎপাদন করা হতো। কার্যত এই পারিবারিক উৎপাদনে নারীর ভূমিকা ছিল মূখ্য। ধোপারাও সম্ভবত নিজেরাই নিজের ক্ষার উৎপাদন করে চাহিদা মিটিয়ে ফেলতো। পাশাপাশি চুল ও শরীর পরিষ্কার করতে তিলের পাতা, ক্ষার, খৈল এবং উঁইয়ের মাটি ও সাজিমাটির প্রচলন ছিল যা সমসাময়িক বিশ্বে প্রচলিত প্রযুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণও বটে। বাংলার এই ধৌতকরণ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত উপকরণ, জ্ঞান ও প্রযুক্তি আমদানি নির্ভর নয় আরোপিতও নয়, বরং অনেকটা স্ব-উদ্ভাবিত ও পরিবেশ বান্ধব।